আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

শীতকালীন সংখ্যা

পৌষ - মাঘ ১৪৩০

নতুন বছর পড়ে গেল। শীত যাবার আগে তার শেষ কামড় দিয়ে যাচ্ছে। মাঠে মাঠে সেজে উঠছে নানান ধরনের উৎসবের আবহ। সবার মুখে হাসি ফুটুক এই কামনাই রইল নতুন বছরে আমাদের প্রিয় পাঠকদের ভজন্য। সবাই ভালো থাকুন। আনন্দে থাকুন।

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

এক দুই নয়, একেবারে এক লক্ষ। হ্যাঁ , ইয়োরোপের জলবায়ু বিশ্লেষণী সংস্থা কোপার্নিকাসের দাবিতে মাথা ঘুরে যাবার অবস্থা গোটা পৃথিবীর ওয়াকিবহাল মহলের যে, উষ্ণতার দিক থেকে সদ্য শেষ হওয়া ২০২৩ নাকি গত এক লক্ষ বছরের সমস্ত হিসেব ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে।

হিসেব বলছে বিশ্ব উষ্ণায়নের নিরিখে ভিত্তিবর্ষ ধরা হয় ১৮৫০ সালকে, কারণ ওই বছরেই ইয়োরোপে শিল্প বিপ্লবের শুরু হয়েছিল। বিশ্ব জলবায়ু সংস্থার দাবি হল, গত বছরের গড় তাপমাত্রা ছিল সেই ভিত্তি বর্ষের থেকেও ১.৪৮ ডিগ্রি বেশি। মাস খানেকও হবে না, দুবাইতে সি ও পি ২৮ নামে জলবায়ু সম্মেলনে কার্বন জ্বালানি ব্যবহার কমাবার অঙ্গীকার করেছিল ১৪০ টি দেশ। উষ্ণায়নকে বাগে আনার জন্য যত চেষ্টাই চলুক তাতে কাজ হওয়াতে গেলে আরো ভাবতে হবে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। গ্রিন হাউস গ্যাস আর এল নিনো, অর্থাৎ সব মিলিয়ে মহাসাগরগুলির জলের তাপমাত্রা লাগাতার তাপমাত্রা বৃদ্ধিই এর পিছনে একমাত্র কারণ বলছেন তাঁরা। সাফ জানাচ্ছেন তাঁরা যে এরকম চলতে থাকলে বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে উঠবে অচিরেই। আশা করা যাক সেই মারাত্মক অবস্থায় পৌঁছতে যাতে না হয় তার জন্য সব রকম চেষ্টাই করব আমরা। কারণ, আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীকে বাঁচাবার দায় আমাদেরই নিতে হবে।

সূচিপত্র

আগামী বছরটা কেমন যাবে ? Page 4
অশোক সাহা

স্মার্টলি 'স্মার্ট বাংলাদেশ' -এর পথে হাসিনার বাংলাদেশ Page 6
তরুণ চক্রবর্তী

সতী, অভিজিৎ ও নক্ষত্রচক্র (চতুর্থ ভাগ) Page 13
আদিত্য ঠাকুর

বুঁদে Page 19
জয়াশিস ঘোষ

চলে গেলেন উস্তাদ রশিদ খান Page 22
দিব্যেন্দু দে

রাশিদ খান Page 24
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

শীতকালে হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব Page 25
ডা. প্রভাত ভট্টাচার্য

কলকাতার রেজালা Page 26
জাহিরুল হাসান

বিদায়, ফুটবলের কিংবদন্তি Page 28
বাবলু সাহা

কুস্তি জগতে জটিলতা বাড়ছে Page 30
অলক সোম

মোহময়ী কুর্গ (শেষ ভাগ) Page 33
প্রভাত ভট্টাচার্য

অজানার উজানে (চতুর্থ ভাগ) Page 37
বাবলু সাহা

২৯ কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব Page 39
চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

লেখা ১

আগামী বছরটা কেমন যাবে ?

অশোক সাহা

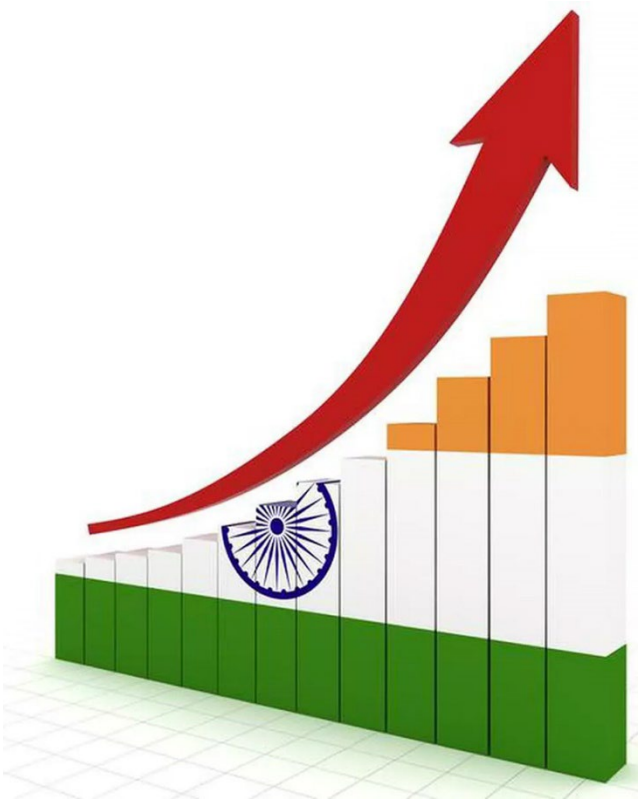

ব্রিটেনকে পেছনে ফেলে ইতিমধ্যেই বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির স্থানে উঠে আসা ভারতের তরফে জার্মানিকে টপকে চতুর্থ স্থানে যাওয়া নাকি এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র : বুক ফুলিয়ে যতই এমন দাবি করুক না , মোদি সরকারের রীতিমতো রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া তথ্য হল চলতি অর্থবর্ষে বাজেটের ৪৫ লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে ৪০ কোটিই নাকি উঠে আসতে চলেছে কেবলমাত্র আয়কর, জি এস টি আর কর্পোরেট ট্যাক্স অর্থাৎ দেশের মানুষের পকেট থেকে আসা তিনটে মাত্র করের টাকাতেই।

কেউ বলতেই পারেন এতে সরকারের রাতের ঘুম ছুটে যাবার কারণ কী ! দেশে যদি কর আদায় ভালো হয় তাহলে নিশ্চয় দেশে ব্যবসা ভালোই চলছে। না চললে কর আদায় এই ডিসেম্বরের গোড়াতেই ২০ শতাংশ বাড়ত কি ? অন্য দিকে হিসেবই বলছে চলতি বছরে পেট্রল ডিজেলের মতো পেট্রো পণ্য থেকে আদায়ীক্রিত আদায়ীকৃত মুনাফার হিসেবই বলছে তেল কোম্পানিগুলো এই পেট্রো পণ্য থেকে মুনাফা তুলেছে এক লক্ষ কোটির উপর। অথচ খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার কী বলছে দেখুন । এই হার কিন্তু দেখা যাচ্ছে গত তিন মাসের মধ্যে সব থেকে বেশি।

পেট্রো পণ্যে তেল কোম্পানিগুলো যে মুনাফা অর্জন করেছে তার গুণাগার দিয়েছে কে ? এই প্রশ্নের উত্তর একটাই : দেশের আম জনতা। ঠিক যেমন মুদ্রাস্ফীতির হার তিন মাসের মধ্যে সর্বোচ্চে তুলে নিয়ে যাওয়ায় ভুগেছে প্রধানত আম জনতাই। খুব সম্প্রতি দেশের ২০টি রাজ্যের ৩৫ হাজারের বেশি মানুষের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিশ্বখ্যাত রিসার্চ ট্রায়াঙ্গেল ইন্সটিটিউটের একটি সমীক্ষা বলছে ওই অঙ্কের মধ্যে ২২ শতাংশ মানুষই নানা কারণে তাঁদের সঞ্চয় ভেঙে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন।হিসেবই বলছে দেশের ৭৭ শতাংশ মানুষের রোজগারই মাসে ৩৫ হাজার ছাড়ায় না। শু৭ধু তা-ই নয় , দেশের ৬৫ শতাংশ পরিবারেরই অবস্থা আর্থিক ভাবে দুর্বল । সমীক্ষাই বলছে গত পাঁচ বছরে দেশের ৩০ শতাংশ পরিবার আর্থিক ভাবে এগোতে পারলেও ৭০ শতাংশ পরিবারই তা পারেনি। অথচ স্বয়ং কেন্দ্রই বড়ো মুখ করে খোদ সংসদে দাঁড়িয়ে হিসেব দিচ্ছে যে, গত পাঁচ বছরে ১০ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকার ঋণ মকুব করা হয়েছে শিল্পপতিদের। কেবল তাই নয়, ২ হাজার ৩০০ জন এমন ব্যবসায়ীর ঋণ মকুব হয়েছে যাঁদের ঋণের পরিমাণ রোমহর্ষক ৫ কোটি বা তার বেশি।

সরকারপক্ষীয়দের বক্তব্য একটাই যে, ১৪০ কোটির দেশে অঙ্কটা নেহাতই হাতেগোণা। অন্যদিকে বিরোধীদের কথা, এর পেছনে কারণ একটাই : ঋণ নিয়ে যারা বছরের পর বছর শোধ করছেন না তাঁদের সংখ্যাটা কম দেখানো। যার জন্য বড়ো মুখ করে স্বয়ং অর্থমন্ত্রী বলতে পারছেন , দেশে ব্যাঙ্কের স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে। বিরোধীরা অবশ্য ভুলছেন না যে, গত মার্চ অব্দি ইচ্ছাকৃত ভাবে না মেটানো ঋণের পরিমাণই ছিল ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৭৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে ওই কালপর্ব পর্যন্ত এর মধ্যে সরাসরি টাকা আদায় বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে অনাদায়ী ঋণ মিটিয়ে নেওয়া গেছে মাত্রই ৩৩ হাজার ৮০১ কোটি টাকা। অন্যদিকে আরেকটি হিসেব বলছে রিটেল টেক, কনজিউমার টেক, ফিন টেক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত কেবল এ আই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য কেবল ভারতেই চাকরি খুইয়েছেন ৩৬ হাজার করমী। সংখ্যাটা বিশ্বের ক্ষেত্রে দেখলে নগণ্যই খানিকটা, কারণ বিশ্বে সংখ্যাটা রোমাঞ্চকর ৪ লক্ষ ২৫ হাজার। অর্থাৎ যতদিন যাচ্ছে অবস্থাটা যে আগামী প্রজন্মের জন্যে মোটেই সুখকর হচ্ছে না ঢোঁক গিলে হলেও এতে সন্দেহ রাখছেন না প্রায় কেউই। এর মধ্যেই নতুন বছরের সূত্রপাত যেহেতু , ফলে ভেবে দেখতে হবে বৈকি আগামী বছরটা কতটা বিপজ্জনক হয়ে আসছে।

লেখা ২

স্মার্টলি ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ -এর পথে হাসিনার বাংলাদেশ

তরুণ চক্রবর্তী

ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তাঁর ঝুলিতে। টানা ৪ বার নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে তিনি। তবু তিনি ভোলেননি নিজের প্রতিশ্রুতির কথা। ভোটের ফল প্রকাশ হতেই নিজেই মনে করিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা। দারিদ্রতামুক্ত স্মার্ট বাংলাদেশই হচ্ছে তাঁর লক্ষ্য। এর আগের বার ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়ে তাঁকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন। এখন স্মার্ট বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশকে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা, জননেত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের মানুষও স্মার্টলিই তাঁকে ফের ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে। বিএনপি ও জামায়াতের স্বালাও-পোড়াওয়ের রাজনীতি প্রত্যাখান করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা গণতন্ত্রের পক্ষে। অনেক আসনেই স্বতন্ত্রদের বিজয় বুঝিয়ে দিয়েছে, মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগে নিজেদের অধিকারকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেশ-বিদেশের সাংবাদিক, কূটনীতিক, পর্যবেক্ষকরাও বৈধতা গিয়ে গিয়েছেন বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনকে।

অন্যদিকে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ না নিয়ে ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে মেতে ছিল বিএনপি-জামায়াত জোট। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এই জোটের প্রয় সব কর্মসূচিই ব্যর্থ। মানুষ ভোট দিয়েছেন। ধরে রেখেছেন দেশের স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক পরিবেশকে। কোনও রকম অস্থিরতা সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে তাঁরা বর্জন করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বাংলার মাটিতে নাশকতার কোনও স্থান নেই।

আওয়ামি লিগ কিন্তু নিজেদের প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর। গতবার ভোটের আগে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশের’ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এবার তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ । আসুন ফের একবার ফিরে দেখা যাক, কী বলেছিলেন শেখ হাসিনা। ‘স্মার্ট নাগরিক’ , ‘স্মার্ট সরকার’ , ‘স্মার্ট অর্থনীতি’ ও ‘স্মার্ট সমাজ’ – এই চারটি স্তম্ভের সমন্বয়ে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়া হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত স্মার্ট সোনার বাংলা গড়ার কথাও বলা হয়েছে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে।

তিনি বলেছিলেন, গণতন্ত্র, নির্বাচন ও কার্যকর সংসদের মাধ্যমে ফের গড়ে তোলা হবে স্থিতিশীল বাংলাদেশ। বলা হয়েছে, আইনের শাসন ও মানবাধিকার সুরক্ষার কথা। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ অব্যাহত রাখার কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। ইশতেহার প্রকাশ করে তিনি জনকল্যাণমুখী, জবাবদিহিমূলক, দক্ষ ও স্মার্ট প্রশাসন, জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ক্ষমতায় আসার আগে আওয়ামি লিগ বলেছিল, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নেবে। ক্ষমতায় এসেই সেটা কার্যকর করে দেখিয়েছেন তারা। এবার প্রতিশ্রুতি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ। সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কর্মসূচি চলমান থাকবে। স্থানীয় সরকারকে আরও কার্যকর করার পাশাপাশি ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা স্থাপনের অঙ্গিকার রয়েছে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে।

আওয়ামি লিগ ফের ক্ষমতায় এলে আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনকে গুরুত্ব দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বলা হয়েছিল, পুঁজি পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা। ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি রয়েছে তরুণ যুবসমাজকে ‘তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি’ প্রকল্পের মাধ্যমে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে চায় তাঁরা। বলা হয়েছিল, কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি, শিল্প উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্ষেত্রেও উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে।। শেখ হাসিনার হাত ধরে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার। সেই উন্নয়ন ধারা রাখার প্রতিশ্রুতি রয়েছে ইস্তেহারে। বলা হয়েছে, সুনীল অর্থনীতির মাধ্যমে বিকশিত হবে বাংলাদেশ। সমুদ্র সম্পদের সঠিক ব্যবহার দেশকে আর্থিক ভাবে আরও স্বচ্ছল করে তুলবে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সেবার ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নয়নের কথা বলা হয়েছিল আওয়ামি লিগের ভোট প্রচারে। সর্বজনীন পেনশনের জন্য সময়োপযোগী উদ্যোগ নেয়া হবে। মনে রাখতে হবে, বর্তমান সরকারের আমলেই ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন প্রণীত হয় এবং ২০২৩ সালের ১৭ আগস্ট মাসে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার উদ্বোধন হয়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে কাজ করছে আওয়ামী লীগ। স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার কল্যাণ রূপকল্প-২০২১ এর ধারাবাহিকতায় রূপকল্প-২০৪১ এর কর্মসূচিতে মৌলিক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা উন্নত ও সম্প্রসারিত করার কথা বলা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকেই হাতিয়ার করার কথা বলেছে আওয়ামী লীগ। সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করবে সরকার। আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে-সংস্কৃতির ভেতর দিয়েই সভ্যতা, মানবতা, বিশ্বজনীনতা ও জাতীয়তা সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়। খেলাধূলার বিকাশে প্রত্যেক উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ চলছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্রীড়া ক্লাব গড়ে তুলে বিনা মূল্যে ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে খেলার মাঠের উন্নয়ন, ক্রীড়া অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তাসহ ক্রীড়াসংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রম নীতি আরও বেশি মানবিক করার কথা বলেছে আওয়ামি লিগ। নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নারী উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। গ্রামীণ নারীদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং শ্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে। গ্রামীণ নারীদের অন-লাইনে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অবদান গোটা দুনিয়াই স্বীকার করে। গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি দেশের মধ্যে ৭ম অবস্থানে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করা ও খাপ খাইয়ে চলা

বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় ভৌত-প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জ। তাই সেই চ্যালেঞ্জ সঠিক ভাবে মোকাবেলা করার বিষয়েও অঙ্গিকারবদ্ধ বাংলাদেশ।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অঙ্গিকারবদ্ধ আওয়ামি লিগ। জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশকে স্বাধীনতা উপহার দিয়েছে আওয়ামী লীগ। তাই সেই স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত নৌকার হাতেই। পররাষ্ট্র নীতিতে যুদ্ধ নয়, শান্তিতে বিশ্বাসী বাংলাদেশ। বাংলাদেশ তার ভূখণ্ডে জঙ্গিবাদ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর উপস্থিতি রোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আসলে বাংলাদেশের মানুষ বুঝেছেন, গারলভরা প্রতিশ্রুতি নয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই সম্ভব জাতির উত্তরণ। তাঁর হাত ধরেই সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা স্থিতিশীলতার মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। দেশ এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশের সাফল্য গোটা দুনিয়াতেই প্রশংসিত।

বঙ্গবন্ধু মাত্র ৩ বছর ৭ মাস ৩ দিনে মাথাপিছু আয় ৯১ মার্কিন ডলার থেকে ২৭৭ মার্কিন ডলারে উন্নীত করেছিলেন।। ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ নির্যাতিতা মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে লাভ করা স্বাধীনতার সূর্যকে অস্তমিত করতে জাতিরপিতাকে হত্যা করা হয়। তার কন্যা শেখ হাসিনাকেও অন্তত ১৯ বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে।

২০০৮ সালে আওয়ামি লিগ এককভাবে ২৩৩টি আসন এবং বিএনপি এককভাবে মাত্র ৩০টি আসনে জয়ী হয়। তারপর থেকে বাংলাদেশে শুরু হয় প্রকৃত উন্নয়ন। ১৫ বছরে প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে ৫ .৪০ থেকে ৭.২৫ শতাংশ। মাথাপিছু গড় আয় ১ হাজার ৭২৪ মার্কিন ডলার থেকে হয়েছে ৮ হাজার ৭৭৯ মার্কিন ডলার। অর্থাত ৫ গুণ বেড়েছে। জিডিপির বহর ১২ গুণ বেড়ে ৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৭২ কোটি টাকা থেকে হয়েছে ৫০.৩১ লক্ষ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২১ হাজার ৫ শত কোটি টাকা থেকে হয়েছে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬৭৪ কোটি টাকা। বার্ষিক রাজস্ব আয় ৩৭ হাজার ৮৭০ কোটি টাকা থেকে হয়েছে ৫ লক্ষ কোটি টাকা। মানুষের জীবনমান উন্নততর হয়েছে।

দারিদ্র্যের হার ৪১.৫১ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ১৮.৭ শতাংশ। অতি দারিদ্র্যের হার ২৫.১ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৫.৬ শতাংশ। মানুষের গড় আয়ু ৫৯ বছর থেকে বেড়ে হয়েছে ৭২.৮ বছর। নিরাপদ খাবার পানি পাচ্ছেন ৯৮.৮ শতাংশ মানুষ। আগে সেটা ছিল মাত্র ৫৫ শতাংশ। শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৮৪ জন থেকে ৪ গুণ কমে হয়েছে ২১ । মাতৃমৃত্যু হার প্রতি লাখে ৩৭০ থেকে এখন কমে হয়েছে ১৬১।

বিএনপি-জামায়াতের আমলে ২৮ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর হার এখন ১০০ শতাংশ। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৩৩ হাজার ৫৭৯ থেকে দ্বিগুণ হয়ে এখন হয়েছে ৭১ হাজার। সরকারি ডাক্তারের সংখ্যা ৯ হাজার ৩৩৮ থেকে ৩ গুণ বেড়ে হয়েছে ৩০ হাজার ১৭৩ জন। নার্সের সংখ্যাও বেড়ে ৩ গুণ। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করলেও এখন সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৯৮৪টি। কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ঔষধ প্রদান করা হয়।

স্বাক্ষরতার হার ৪৫ শতাংশ থেকে এখন হয়েছে ৭৬.৮ শতাংশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৫ হাজার ৬৭২টি থেকে হয়েছে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৯১টি। কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ৯টি থেকে ১৮ গুণ বেড়ে হয়েছে ১৬৬টি। কৃষিক্ষেত্রে সরকারি সহায়তায় উৎপাদন বেড়েছে। বিএনপি-জামায়াত জোটের সময় দানাদার শস্যের উৎপাদন ১ কোটি ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে হয়েছে ৪ কোটি ৯২ লক্ষ ১৬ হাজার মেট্রিক টন। সেচের আওতাভুক্ত কৃষি জমি ২৮ লক্ষ হেক্টর থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৯ লক্ষ হেক্টর। মৎস্য উৎপাদন, গবাদি পশু ও পোল্ট্রির সংখ্যা চার গুণ বেড়েছে। চা উৎপাদন বেড়েছে ২ গুণ এবং লবণ ৩ গুণ। কৃষিখাতে ভর্তুকির পরিমাণ ১ হাজার ১৭০ কোটি টাকা থেকে হয়েছে ২৬ হাজার ৫৫ কোটি টাকা। গত অর্থ বছরে সারেই ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ২৫ হাজার ৭৬৬ কোটি টাকা।

ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত রাষ্ট্র নির্মাণ পরিকল্পনা হাতে নেয় আওয়ামী লীগ সরকার। বিএনপি-জামায়াতের আমলে কেউ এই সুবিধা না পেলেও বর্তমান সরকারের আমলে গত নভেম্বর পর্যন্ত ৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭১৪ পরিবার ঘর পেয়েছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন আজ বাস্তব। বিএনপি-জামায়াত জোটের অপশাসনে মোট জনগোষ্ঠীর ইন্টারনেট ব্যবহার ০.২৩ শতাংশ থেকে এখন হয়েছে ৭৮.৫৫ শতাংশ। সক্রিয় মোবাইল ফোন সিম সংখ্যা ১ কোটি ৯০ লক্ষ থেকে এখন ১৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪০ হাজার। ডিজিটাল সেবা সংখ্যা (সরকারি সংস্থা কর্তৃক) ৮টি থেকে হয়েছে ৩ হাজার ২০০। ওয়ান স্টপ সেন্টারের সংখ্যা ২টি থেকে হয়েছে ৮ হাজার ৯২৮টি। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বিএনপি-জামায়াত জোটের বরাদ্দ ২ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা থেকে ৫০ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১ লক্ষ ২৬ হাজার। সামাজিক সুরক্ষা সেবার আওতাভুক্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ২১ লক্ষ থেকে এখন ১০ কোটি ৬১ লক্ষ ১৪ হাজার জন। উপবৃত্তি কার্যক্রমের সুবিধাভোগী (শিক্ষা ক্ষেত্রে উপবৃত্তি, বৃত্তি, উচ্চশিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমে উপকারভোগীর সংখ্যা) শূণ্য থেকে হয়েছে ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ১০ হাজার

৭৫৬ শিক্ষার্থী। বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা এখন ৫ গুণ বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ১৩ লক্ষ ১০ হাজার জন। খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমের উপকারভোগী (ভিজিএফ, ভিজিডি, ভিডব্লিউবি, টিআর, জিআর, কাবিখা, কাবিটা, ইজিপিপি, ও এমএস খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি কার্যক্রমের সুবিধাভোগী) ৪ লক্ষ ৩০ হাজার জন থেকে হয়েছে ৪ কোটি ৬১ লক্ষ ১৫ হাজার জন। হিজড়া জনগোষ্ঠীর উপকারভোগীর সংখ্যাও ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নেও এসেছে বিপুল সাফল্য। ২০০৬ সালের জেলা, আঞ্চলিক ও জাতীয় মহাসড়ক ১২ হাজার ১৮ কিলোমিটার থেকে ৩ গুণ বেড়ে হয়েছে ৩২ হাজার ৬৭৮ কিলোমিটার। গ্রাম্য সড়ক ৭৬ গুণ বেড়ে হয়েছে ৩ হাজার ১৩৩ কিলোমিটার থেকে হয়েছে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৪৬ কিলোমিটার। মোট রেলপথ ২ হাজার ৩৫৬ কিলোমিটার থেকে হয়েছে ৩ হাজার ৪৮৬ কিলোমিটার। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সক্ষমতা ১১টি বিমান থেকে হয়েছে ২১টি বিমান এবং অত্যাধুনিক বিমান দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

বিএনপির আমলে শূণ্য এখন আওয়ামী লীগের আমলে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত জেলা ৩২টি, ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত উপজেলা ৩৯৪টি, ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা ৮ হাজার ৯৭২টি, ইউনিয়ন পর্যায়ে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ ২ হাজার ৬০০টি ইউনিয়ন, দেশে উৎপাদিত মোবাইল ফোন ব্র্যান্ডের সংখ্যা ১৫টি, হাইটেক পার্ক, সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক এবং শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার ১০৯টি, ফ্যামিলি কার্ড ভিত্তিতে খাদ্য সহায়তা প্রাপ্ত উপকারভোগী (টিসিবি কর্তৃক প্রদত্ত) প্রায় ৫ কোটি মানুষ, মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৮৪ লক্ষ জন, কৃষকদের প্রদানকৃত কৃষি কার্ডের সংখ্যা ২ কোটি ৬২ লক্ষ কৃষক।

কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৬ কোটি ৭৮ লক্ষ জন থেকে বেড়ে হয়েছে ১২ কোটি ৩৩ লক্ষ। ওয়ার্কিং ফোর্সে মহিলাদের অংশগ্রহণ ২১.২ শতাংশ থেকে হয়েছে ৪৩.৪৪ শতাংশ।

বেকারত্বের হার ৬.৭৭ শতাংশ থেকে অর্ধেক কমে হয়েছে ৩.৪১ শতাংশ। দেশে মোট ৭ কোটি ৭ লক্ষ ৩০ হাজার জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি মাসিক ১ হাজার ৪৬২ টাকা থেকে হয়েছে মাসিক ১২ হাজার ৫০০ টাকা।

বিরোধীদের ধ্বংসাত্মক রাজনীতির বিপরিতে আওয়ামি লিগের ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচিরই জয় হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই জয়কে জনগণকেই উতসর্গ করেছেন। জনগণ খুশি। খুশি ভারত, চীন, রাশিয়া-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ। তাঁরা তাই শুভেচ্ছা জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত খালেদা জিয়া-তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বা বিএনপি। এমনকী, আওয়ামি লিগের সঙ্গে থেকেও বেশি দর কষাকষি করার শাস্তি পেয়েছে জেনারেল এইচএম এরশাদের প্রতিষ্ঠিত জাতিয় পার্টিও। সংসদীয় রাজনীতিতে তাঁদের শক্তি আরও কমেছে এবার। আর আওয়ামি লিগের যেসব নেতা নিজেদের অপরিহার্য মনে করছিলেন, দলে থেকেও আদর্শচ্যুত হয়ে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন, তাঁদেরও পরাস্ত করে জনগণ বুঝিয়ে দিয়েছেন, গণতন্ত্রে শেষ কথা তাঁরাই বলার অধিকারি। এবং বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত বহুদলীয় গণতন্ত্র।

সতী, অভিজিৎ ও নক্ষত্রচক্র (তৃতীয় ভাগ)

আদিত্য ঠাকুর

আমরা আজ যা বিজ্ঞান বলে মানি তার ভাষা যেমন অঙ্ক এবং পরীক্ষার দ্বারা যাচাই ছাড়া কোন তত্ত্বকে যেমন গ্রহণ করি না, প্রাচীন কালে সেই অর্থে বিজ্ঞান প্রকাশিত হয় নি। জ্ঞানী মানুষ যাঁদের ঋষি বলে অভিহিত করা হত তাঁরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ অনেক সময়ই জটিলতার কারণে রূপকাকারে গল্প কাহিনীর মাধ্যেমে ব্যক্ত করতেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সত্যটি পৌঁছে দেওয়া সাধারণ মানুষের কাছে। অনেক পৌরাণিক আখ্যান আর লৌকিক উৎসবের দিকে ফিরে তাকালে ঘটনার উৎসমূলে আমরা প্রাকৃতিক জ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানকে খুঁজে পাব। এই নিয়ে বাংলা স্ট্রিট-এ চলছে একটি ধারাবাহিক। চতুর্থ ভাগ রইলো এই সংখ্যায়...

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

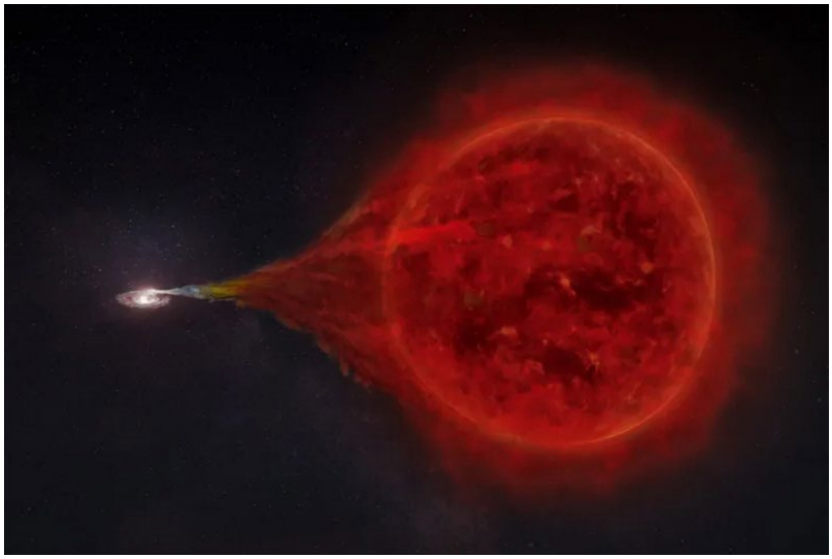

একটি তারা আগে আকাশে ছিল কিন্তু এখন নেই তা কীভাবে সম্ভব হতে পারে ? কয়েকশো কোটি বছরে এমন ঘটনা হতেই পারে, কারণ তারাটির মূল জ্বালানি হাইড্রোজেন শেষ হয়ে যাবার পরেও বেশ কয়েকটি পর্যায় পর্যন্ত তারাটি আলো বিকিরণ করতে পারে, যেমন লাল দানব তারা (Red giant star), অথবা শ্বেত বামন তারার (White dwarf star) ক্ষেত্রে হয়। সূর্যের মতো মাঝারি মাপের তারারাও তাদের অন্তিমদশায় এইভাবেও বেশ কয়েক কোটি বছর আলো বিকিরণ করে, তারপর একসময় সেগুলো নিভে যায়। ফলে তাদের খালি চোখে বা সাধারণ দূরবীন দিয়ে আর দেখা যায় না।

এই ধরনের তারা ছাড়াও আরেক ধরনের তারা আছে যারা সূর্যের থেকে অনেকটা বড়, অর্থাৎ যাদের ভর সূর্যের থেকে অনেকটা বেশী। এই ধরনের তারাদের লাল দানব পর্যায়ের পর একটি ভয়ংকর বিস্ফোরণের মাধ্যমে তাদের তারকা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই ঘটনাটিকে বলা হয় সুপারনোভা বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণের ফলে তারাটির বাইরের আবরণ (Supernova Remnant) চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ঔজ্জ্বল্য কয়েকদিনের জন্য ভীষণ ভাবে বেড়ে যায়। একটি গোলার্ধের খোলা চোখে দেখা সমস্ত তারার মোট ঔজ্জ্বল্যের তুলনায় একটা -৪ মাত্রার সুপারনোভার ঔজ্জ্বল্যের মান সমান হয় (তারার ঔজ্জ্বল্যের মাত্রা সম্পর্কে পরে বলা হয়েছে)। তারার দূরত্বের ওপর নির্ভর করে আমরা তারার অবশেষকে কতটা উজ্জ্বল দেখব। ২৫ আলোকবর্ষের মধ্যে সুপারনোভা বিস্ফোরণ হলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব লোপ পাবে, এমনই তীব্র হবে সেই বিকিরণের ক্ষতিকর কণার স্রোত এবং বিস্ফোরণের অভিঘাত। শখানেক আলোকবর্ষ দূরের কোন তারা সুপারনোভা পর্যায়ে গেলে দিনের বেলা সূর্যের আলোর মাঝেও উজ্জ্বল সুপারনোভাটিকে দেখা যেতে পারে।

সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর তারাটির বিপুল ঔজ্জ্বল্য বিস্ফোরণের দিন কয়েক পরেই কমে যায় আর বড়জোর একশ-দুশো বছর তারাটির অবশেষকে আকাশে চিহ্নিত করা যায় ক্রমশ ক্ষীয়মান ঔজ্জ্বল্যের একটি বস্তু হিসাবে। তারপর সেটি নির্বাপিত হয়।

এই বিস্ফোরণের সময় তারাটির বহু অংশ আকাশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পরে। তারার বিস্ফোরণের মুহূর্তের ভরের ওপর নির্ভর করে সেই সমস্ত মহাজাগতিক ঘটনা।

পাঠকের জ্ঞাতার্থে জানাই, কালপুরুষ নক্ষত্রমন্ডলের আর্দ্রা তারাটির বর্তমানে লাল দানব পর্যায় চলছে, যে কোন সময়ে তারাটির সুপারনোভা বিস্ফোরণ হতে পারে, আমরা জানি না ইতিমধ্যেই সেটিতে সুপারনোভা বিস্ফোরণ হয়েছে কিনা!

আর্দ্রা পৃথিবী থেকে ৫২০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে এবং এটির দীপ্তি সূর্যের তুলনায় ১৫০০০ গুণ বেশী। তারাটির ব্যাস ১.২৩৪ বিলিয়ন কিলোমিটার। সূর্য সমেত পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথটিকে এই দানব তারা অনায়াসে তার জঠরে স্থান দিতে পারে!

সুপারনোভা বিস্ফোরণ এবং তৎপরবর্তী ঘটনা নিয়েই বড় প্রবন্ধ লেখা যায়। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এর বেশী আলোচনার সুযোগ নেই। তাই মূল বক্তব্যে ফিরে যাওয়া যাক।

তারার ছড়িয়ে পড়া অবশেষগুলিকেও (সাধারণ ভাবে গ্যাসীয় ধূলিকণা হিসাবে) অনেক ক্ষেত্রে আকাশে আলো বিচ্ছুরণ করা বস্তুর মতো চিহ্নিত করা যায় এবং সেগুলিও একসময় নির্বাপিত হয়।

<u>সপ্তম পরিচ্ছেদ</u>

অভিজিৎ নক্ষত্রভাগের অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেটি ছিল আমাদের ছায়াপথের বা আকাশ-গঙ্গার বা Milky Way galaxy এর উজ্জ্বল ধারার মাঝে। অভিজিৎ নক্ষত্রভাগের মধ্যে ঠিক কোন কোন তারা ছিল তা এখন নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব নয়, তেমন কোন তথ্য বৈদিক রচনায় উল্লেখিত হয়নি। তবে সতীর কাহিনী থেকে বোঝা যায় সতী অভিজিৎ নক্ষত্রভাগের অন্তর্গত একটি তারা ছিল। বেদাঙ্গ এবং তৎপরবর্তী জ্যোতিষ গ্রন্থে সতী নামের কোন তারার উল্লেখ না থাকায় বলা যায়, আকাশের ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন তারা ছিল না। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কাল প্রায় ১৪০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। এই সময়কালে সূর্যের বিষুব ক্রান্তিপাত হ'ত ভরণী নক্ষত্রে। সূর্যের দক্ষিণায়ন অশ্লেষা নক্ষত্রে এবং উত্তরায়ণ ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে সংঘটিত হ'ত। বেদাঙ্গ জ্যোতিষকালে নক্ষত্রক্রম শুরু হ'ত ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ অনুযায়ী ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের অর্ধেক অংশ মকর রাশিতে এবং অপর অর্ধেক কুম্ভ রাশিতে অবস্থিত। বর্তমান হিসাবে নক্ষত্রচক্রে শ্রবণা নক্ষত্রের ক্রম ২২তম এবং ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের ক্রম ঠিক তার পরেই ২৩তম।

আমরা সতীর উপাখ্যানে দেখতে পাই মৃত সতীর দেহ নিয়ে মহাদেবের পূর্ব দিকে ভ্রমণ এবং বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শনির সতীর মৃতদেহের মধ্যে প্রবেশ এবং তাঁদের দ্বারা সতীর মৃতদেহের নির্দিষ্ট কিছু অংশ খণ্ড খণ্ড করে দেওয়া। শরীরের অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য দেবতারা খণ্ডবিখণ্ড করেন এবং সেগুলি আকাশ গঙ্গায় বিলীন হয়ে যায়।

সতী তারা হলে এই ঘটনাগুলো সুন্দর ভাবে মিলে যায় একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের সঙ্গে।

সুপারনোভার অবশিষ্টাংশ (Remnants of Supernova) মধ্যে যেগুলো আকারে বড় ছিল সেগুলোই চিহ্নিত করা হয়েছিল শক্তি মহাপীঠ হিসাবে। বাকি অগুনতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবশেষ মিলিয়ে গেছিল আকাশগঙ্গা বা Milky way galaxy -র আলোকোজ্জ্বল পথে। এখানে আরও একটি বিষয় বলা প্রয়োজন। শ্রবণা নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম বিষ্ণু। সম্ভবত

সুপারনোভার দ্যুতিতে আশেপাশের সমস্ত জ্যোতিষ্কের প্রভা ম্লান হয়ে গিয়েছিল এবং শ্রবণা তারাটির অথবা শ্রবণা নক্ষত্রভাগও ঢাকা পড়ে গেছিল সুপারনোভার দীপ্তিতে। তাই রূপকের আশ্রয় নিয়ে বলা হয়েছিল বিষ্ণু (অর্থাৎ শ্রবণা) সতীর দেহের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। হয়তো শনি গ্রহও সেই সময় শ্রবণা নক্ষত্রে অবস্থান করছিল, ফলে শনিও সুপারনোভার দীপ্তিতে ম্লান হয়ে গেছিল। শনি এবং বিষ্ণুর সতীর মরদেহে প্রবেশের এটি একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে। মহাদেবের পূর্ব দিকে গমনের অর্থ, চেষ্টা হয়েছিল সতীর অবশিষ্ট অংশ থেকে নতুন করে বর্ষ গণনা শুরু করার, কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি, কারণ নক্ষত্রক্রম ও নক্ষত্রচক্র আগে নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

অভিজিৎ নক্ষত্রভাগে অভিজিৎ নিশ্চিত ভাবেই উজ্জলতম তারা ছিল, সতী অপেক্ষাকৃত কম ঔজ্জ্বল্যের তারা। সেকারণেই অভিজিৎ ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic) থেকে দূরে হলেও অভিজিৎ ছিল যোগতারা এবং অভিজিতের নামেই নক্ষত্রভাগের নাম হয়েছিল অভিজিৎ নক্ষত্রের।

উত্তর-আষাঢ়ার (ক্রম ২১) ১০$^{\circ}$, শ্রবণার (ক্রম ২২) ১৩$^{\circ}$ ২০', ধনিষ্ঠার (ক্রম ২৩) ৬$^{\circ}$ ৪০' – এই তিন নক্ষত্রের অংশ নিয়ে বর্তমান মকররাশি গঠিত। সুতরাং সতী নামের তারার অবস্থান ছিল উত্তর-আষাঢ়া এবং শ্রবণা নক্ষত্রের মধ্যবর্তী কোন স্থানে।

৩০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ নাগাদ বৈদিক জ্যোতিষে রাশির ধারণা প্রবর্তিত হয়নি। কিন্তু বিশ্বের অন্য অনেক দেশের মতো আকাশে তারাদের অবস্থানের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রাণীর রূপ তাঁরা কল্পনা করেছিলেন নিশ্চিতভাবেই। সতী পরিত্যক্ত হওয়ার পর নক্ষত্রক্রমের নতুন করে পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হয়েছিল এবং সায়ন বছর কোন নক্ষত্র থেকে গণনা করা হবে ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় নির্দিষ্ট করতে হয়েছিল।

দক্ষ প্রজাপতি স্বয়ং নক্ষত্রচক্র, সুতরাং সংস্কার শুরু হয়েছিল দক্ষকে দিয়েই। দক্ষের মাথা ভস্মীভূত হয়েছিল। এর অর্থ হতে পারে পূর্ব কল্পিত মকরের মাথার কাছেই সুপারনোভা বিস্ফোরণ হয়েছিল অর্থাৎ সতী দেহত্যাগ করেছিলেন। সতী তারাটি হয়তো আগের মকররূপের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় তারা বা আলোক বিন্দু ছিল, সুতরাং সেই তারাটি না থাকায় মকর রূপ বিনষ্ট হয় এবং মকরের পূর্বের মুখ বা মাথা অজ বা ছাগলের মাথা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

দক্ষের মাথার পর আসে পুনরায় যজ্ঞ শুরু করে সুসম্পন্ন করা। আগেই বলা হয়েছে "ঋগ্বেদে যজ্ঞের অর্থ ছিল – জীবনের কর্ম, কর্মের কাল সংবৎসরব্যাপী। সেই নিমিত্ত বছরের নামান্তর ছিল যজ্ঞ" । অর্থাৎ বছরের শুরু সংজ্ঞায়িত হয়েছিল নতুন করে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে নক্ষত্রের ক্রম শুরু হ'ত শ্রবিষ্ঠা বা ধনিষ্ঠা নক্ষত্র (ধনিষ্ঠার বর্তমান নক্ষত্র ক্রম ২৩) থেকে। Delphinus নক্ষত্রমন্ডলের চারটি তারা Alpha(α), Beta(β), Delta(δ) ও Gamma(γ) এই চারটি তারা নিয়ে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র গঠিত। ধনিষ্ঠা নক্ষত্র (যোগতারা β Delphini) মকর রাশিতে অবস্থিত।

সম্ভবত সতীর বিলুপ্তি এবং অভিজিতের নক্ষত্রক্রম থেকে বাদ যাওয়ার কারণে নক্ষত্র বিন্যাস নতুন করে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল এবং পরবর্তী কালে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রকে, নক্ষত্র ক্রমের প্রথমে রাখা হয়েছিল। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে যখন সূর্যের উত্তরায়ণ হ'ত, তখন বিষুব ক্রান্তিপাত হ'ত কৃত্তিকা নক্ষত্রে। সতীর অবলুপ্তি তারও পূর্ববর্তী ঘটনা।

এখানে নক্ষত্রের ক্রম নিয়ে বারবার বলা হচ্ছে, কারণ ক্রম বিষয়টি প্রাচীন কালে নির্দিষ্ট ছিল না, সেটির বদল হ'ত। বদলের মূলে ছিল অয়নচলন বলে একটি ঘটনা। পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর ও দক্ষিণ মেরু গামী অক্ষ (Polar Axis) আকাশের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে ২৫৮০০ বছরে একবার করে আবর্তিত হয়। এর ফলে বিষুব ক্রান্তিপাত বিন্দু (Vernal Equinoxial point) সূর্যপথ বা ক্রান্তিবৃত্তের (Ecliptic) ওপর দিয়ে ২৫৮০০ বছরে একবার করে আবর্তিত হয়। এই বিষয়টিকে অয়নচলন বলে, এর গতিমুখ ক্রান্তিবৃত্ত বরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে হয়। ফলে নির্দিষ্ট একটি নক্ষত্রে অয়ন অবস্থান করে গড়ে (২৫৮০০÷২৭) বা প্রায় ৯৫৬ বছর। সূক্ষ্ম হিসাবে ৫০০০ বছর আগে এক নক্ষত্র পরিমাণ (১৩° ২০') আকাশ পথ অতিক্রম করতে অয়নের সময় লাগতো প্রায় ৯৭৬ বছর। অয়নচলনের কারণে নির্দিষ্ট কোন একটি নক্ষত্রের সাপেক্ষে বছর শুরু হয় এই কথা বলা যায়না। বরং বিভিন্ন নক্ষত্রে বিভিন্ন সময়ে বছর শুরু হ'ত এই বিষয়টি ভারতের প্রাচীন জ্যোতির্বিদ ঋষিদের জানা ছিল। অয়নচলনের সাপেক্ষে

যে বছর গণনা করা হয় তাকে সায়ন পদ্ধতির বছর বা Tropical Year বলা হয়। সুতরাং বর্ষের মুখ এবং বিভিন্ন ঋতুর শুরু নির্ণয়ে অয়নচলনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

পঞ্চম ভাগ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

বুঁদে

জয়াশিস ঘোষ

ঠিক এই মূহুর্তে আপনার বাড়িতে কোকা কোলা আর তন্দুরি চিকেন সহযোগে ভরপুর আড্ডা চলছে। সঙ্গে ধরা যাক টিভিতে আই পি এলের ম্যাচ। বিরাট কোহলির ব্যাটে রানের ফুলঝুরি। ঠিক সেই মূহুর্তে ধরা যাক আপনার বাচ্চার দশ বছরের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বোতলের পর বোতল বিসলেরি উড়ে যাচ্ছে। প্রচন্ড গরমে সবার গলা শুকনো। ঠিক সেই মূহুর্তে বরফঠান্ডা বোতলের জলে প্রেমিকার মুখ ধুইয়ে দিচ্ছে প্রেমিক। হাইওয়ের ধারে। আর ঠিক এই মূহুর্তে লছমি দাঁড়িয়ে আছে তাদের বাড়ির চল্লিশ ফুট গভীর কুয়োটির সামনে। গতকালও নীচে রুপোর পাতের মতো জল দেখা যাচ্ছিল। আজ শুকনো বালি.....

লছমি কে, তার বাড়ি কোথায় জানার আগে আপনার সামনের বোতল থেকে শেষ জলবিন্দুটুকু গলায় ঢেলে নিন। কারণ পরের অংশটুকু লছমির হাতের কলসীর মতো শুকনো, জ্বালা ধরা, বিভীষিকাময়। সেই আগুনে সফরে না যেতে চাইলে বিজ্ঞাপন বিরতিতে দেখে নিন, 'বুঁদ বুঁদ মে বিশ্বাস'! বাকীরা চলুন ঘুরে আসি লছমির গ্রাম রাজস্থানের কালা ডেরা থেকে। মরুরাজ্যের এই গ্রামে কোকা কোলার বোটলিং প্লান্ট। প্রতি মিনিটে যেখানে ৬০০ বোতল কোকা কোলা উৎপাদিত হয়। যার মূল উপকরণ হল জল। লছমি ও তার হাজার হাজার প্রতিবেশীর বুকের ভেতর ডিপ বোরওয়েল বসিয়ে মাটির গভীর থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে দেড় লক্ষ কিউবিক মিটার জল। যে জলে ১০০০০ বিঘা জমি চাষ করা যেত এবং ৫০০০ পরিবারের মুখে তুলে দেওয়া

যেত দু বেলার খাওয়ার। মনে রাখবেন, জায়গাটা রাজস্থান। আপনার বাড়িতে যে কোকা কোলার বোতল খুলে পেগ বানাচ্ছেন, সেটা লছমির শুকনো কলসী থেকে তুলে আনা। চিয়ার্স!

এই কালা ডেরা গ্রামে একসময় কুয়োতে ১০-১৫ ফুট নীচেই জল পাওয়া যেত। এখন চাষের জন্য জল তোলার পাম্পের মোটর পর্যন্ত দুশো ফিট নীচে লাগাতে হয়। ভূগর্ভস্থ জল দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছে। তার সাথে মিশছে ভয়ঙ্কর সব রাসায়নিক। বাধ্য হয়ে কর্পোরেশন পানীয় জলের দাম নিচ্ছে যা একসময় বিনামূল্যে পাওয়া যেত। ৩০-৪০ কিলোমিটার দূরে যেতে হচ্ছে জল আনার জন্য। আপনার বাড়িতে এসিতে বসে যখন পরিবেশ রক্ষার স্ট্যাটাস দিচ্ছেন, তখন লছমিরা তাদের বাড়ির শেষ জলবিন্দুটা আপনার নরম পানীয়ের গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছে…

এক লিটার জল সর্বাধুনিক পরিশোধন ব্যবস্থায় আপনার পান করার উপযোগী করে তুলতে খরচ পড়ে ২৫ পয়সা। তারপর তাকে সুন্দর প্যাকেজ দেওয়া হয়। নায়ক নায়িকা, বিজ্ঞাপন, ম্যাচ স্পনসর, বহন, সংরক্ষণ সব খরচ যোগ করেও সাড়ে তিনটাকার বেশী খরচ হয় না। আপনি কেনেন কুড়ি টাকায়। কারণ ফোঁটায় ফোঁটায় বিশ্বাস আছে তো। এরকম চরম লাভের কারণে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে জলের কোম্পানিগুলো। এখন প্রায় ২৫০০ ব্র্যান্ডের জল আছে। এর সাথে বেআইনি আরো যে কত জলের কারখানা আছে তার ইয়ত্তা নেই। বিসলেরি, কিনলে, অ্যাকোয়াফিনার মত বড় কোম্পানি যেমন আছে, আপনার পাড়ায় ঘুপচি ঘরে ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে ২০ লিটার জল ৫০ টাকায় বেচে দেওয়া জল বিশুও আছে। সবারই মূল উপকরণের মূলধন এক। শূন্য!

কিন্তু খরচ কি সত্যিই এত কম? অন্ধ্রপ্রদেশের খাম্মামে কোকা কোলার কিনলে ব্র্যান্ডের যে কারখানা আছে, প্রতিদিন সেখানে ২,২৫, ০০০ লিটার জল লাগে! যার ফলে কাছাকাছি সাত্তুপল্লি গ্রামের, যার জনসংখ্যা ২৫০০০, সব কুয়ো শুকিয়ে গেছে। তামিলনাড়ু, গুজরাটের ভূগর্ভস্থ জলের চরম শঙ্কট দেখা গেছে। কেরালায় পালাক্করে কৃষকেরা কোকা কোলার বিরুদ্ধে মামলা করেছে জলের অনৈতিক ব্যবহার ও টক্সিক বর্জ্য মেশানোর জন্য। প্রতিদিন জলস্তর নীচে নেমে আছে, আরো নীচে, আমাদের ক্ষমতার বাইরে। শুকিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। আমাদের ফ্রিজে বন্দী থাকছে লছমিদের চোখের নুন….

জলস্তর নিয়ে ভারতবর্ষে আইনটিও অদ্ভুত। জমি যার, মাটির নীচের জলও তার। অর্থাৎ মাত্র এক স্কোয়ার মিটার জায়গা কিনে একটা ডিপ টিউবয়েল বসিয়ে পুরো এলাকার পানীয় জল শুষে নিতে পারে একজন। তার জন্য তাকে কোন দাম দিতে হবে না।

ভাবুন একবার। হাজার হাজার ব্যবসাদার কোটি কোটি বোতলে জল ভরে প্রতিদিন তুলে দিচ্ছে আমাদের হাতে। আর আমরা? সেই জল, নরম পানীয় খেতে খেতে পরিবেশের কবিতা লিখছি।

এই আইন পরিবর্তন হওয়া দরকার। বোতলবন্দী জল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার বেআইনি করা দরকার। জল মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ প্রয়োজন যারা তামিলনাড়ু, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাটের খরা প্রবল অঞ্চল থেকে জল শুষে নিচ্ছে রোজ। আমাদেরও আর একটু সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বাড়ি থেকে জলের বোতল নিয়ে বেরোন। রাস্তায়, স্টেশনে জল না কিনে সরকারী জলের ভেন্ডিং মেশিন ব্যবহার করুন। হ্যা, ওটাও পরিশ্রুত। আপনার মনের অবিশ্বাস তৈরি করেছে জলের কোম্পানিগুলো। বদলে ওরা কী দিচ্ছে? উপচানো প্লাস্টিক, অপরিশোধিত ভূগর্ভস্থ জল আর জলবিহীন পৃথিবী।

নরম পানীয়ের অপকারিতা নিয়ে আর বলছি না কিছু। বোতলের জল তৃষ্ণা দূর করে ৩০% ভারতের। বাকী ৭০% তৃষ্ণার্ত। আজকে আপনার আমার বাড়িতে জলের ছড়াছড়ি। মনে রাখবেন, আগামী দিনে এই জলটুকু জুটবে না আমাদের। তাকিয়ে থাকতে হবে বহুজাতিকের বর্জ্যের দিকে। যেমন আজকে লছমি শুকনো কলসী নিয়ে তাকিয়ে আছে আপনার দিকে...

তথ্যঋণ – গ্রোথ অফ প্যাকেজড ড্রিনকিং ওয়াটার, চ্যাপ্টার ৬, শোধগঙ্গা।

চলে গেলেন উস্তাদ রশিদ খান

দিব্যেন্দু দে

শেষ হল লড়াই। প্রয়াত হলেন হিন্দুস্তানি ধ্রুপদী সংগীতের ক্ষেত্রে আজকের সময়ের অন্যতম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব রশীদ খান। ঐশ্বর্যমণ্ডিত কণ্ঠের জাদুতে যিনি মাত করেছেন শ্রোতার হৃদয়, তাঁর প্রয়াণ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতে অপরিমেয় ক্ষতি। উস্তাদ রশিদ খানের প্রয়াণে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সেই 'সোনার কণ্ঠ' এখন অতীত।

উত্তরপ্রদেশের বদায়ূঁতে জন্ম রাশিদের। রামপুর-সাসওয়ান ঘরানার শিল্পী। যে ঘরানার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইনায়েত হুসেন খাঁ-সাহিব। তবে রাশিদের প্রথম তালিম তাঁর মামা গোয়ালিয়র ঘরানার উস্তাদ গুলাম মুস্তাফা খাঁ-সাহিবের থেকে। খুব অল্প বয়সে রাশিদকে মুম্বইয়ে নিয়ে যান তাঁর মামা। সেখানে এক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করান। সঙ্গে খানিক তালিমও দেন। কিন্তু সেখানে কিছু ভাল লাগেনি রাশিদের। ফলে তিনি ফিরে আসেন বদায়ূঁ। বদায়ূঁতে ফিরে রাশিদ তালিম নেওয়া শুরু করেন রামপুর-সাসওয়ান ঘরানার দিকপাল উস্তাদ নিসার হুসেন খাঁ-সাহিবের কাছ থেকে। যিনি ছিলেন সম্পর্কে রাশিদের দাদু।

ছোটোবেলায় আর পাঁচজন শিশুর থেকে আলাদা ছিলেন না রশিদ। ছোটবেলায় রিয়াজ করতে চাইতেন না। বেশি ক্ষণ রিয়াজ করলে 'বোর' হয়ে যেতেন। মনে হত, গানবাজনা ছেড়ে দিই। দাদু নিসার হুসেন খাঁ-সাহিব ছিলেন কড়া প্রকৃতির মানুষ। ১৯৭৮ সালে খাঁ-সাহিব চলে আসেন কলকাতায়। সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমি (এসআরএ)-র গুরু হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। সঙ্গে আসেন রাশিদও। তিনি

পরীক্ষা দেন এবং ‘স্কলার’ হিসাবে দাদুর কাছে শিক্ষা শুরু করেন। সে সময়ে তাঁর পরীক্ষা নিয়েছিলেন রাইচাঁদ বড়াল, এ কানন, মালবিকা কানন, বিজয় কিচলু, ভিজি যোগ এবং দীপালি নাগের মতো ব্যক্তিত্ব।

রাশিদের নিজের ঘরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ‘বোলতান’ । যা রাশিদের গায়কিতে শেষ দিন পর্যন্ত ধরা দিত। সেই সঙ্গে তাঁর গানে উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে ‘তারানা’ । যা তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। কারণ, উস্তাদ নিসার হুসেন খাঁ-সাহিব তারানা গায়নকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। গুরু সব সময় বলতেন, আর যা-ই করো, ভুলেও কাউকে কোনো দিন হিংসে কোরো না। হিংসে করলে সঙ্গীতের মৃত্যু অনিবার্য। সাধনা করতে করতেই নিজস্ব গায়কি তৈরি হয়। সঙ্গীত ‘দিল আর দিমাগ’ -এর কাজ। শিষ্য মনে প্রাণে মেনেছেন তাঁকে ।

জীবনের প্রথম অনুষ্ঠান কলকাতাতেই। ১০-১১ বছর বয়সে। যেখানে রশিদের গানের পর পণ্ডিত রবিশঙ্করের বাজনা ছিল। সেই শুরু। তারপর দীর্ঘ এবং নিজস্ব পথে পথ চলা।পণ্ডিত ভীমসেন জোশীর সঙ্গে বিশেষ সখ্য ছিল রাশিদের। পুণেতে বন্ধুর অনুষ্ঠান থাকলে ভীমসেন উপস্থিত থাকতেনই।

মূলত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত গাইলেও ফিউশন, বলিউড এবং টলিউডের ছবিতে বহু গান করেছেন রাশিদ। তার মধ্যে ‘যব উই মেট’ -এর ‘আওগে যব তুম ও সাজনা’ অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

গজলের অ্যালবাম করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছেন। তাঁর কণ্ঠে উস্তাদ বড়ে গুলাম আলির ঠুংরি ‘ইয়াদ পিয়া কি আয়ে’ শুনতে চেয়ে অনুরোধ আসত শ্রোতাদের।

সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার, পদ্মভূষণ সম্মান যেমন পেয়েছেন, তেমনই বাংলা থেকেও পেয়েছেন বঙ্গবিভূষণ সম্মাননা। বাংলাকে ভালোবেসে যিনি কলকাতায় থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই বাংলার মাটিতেই বিদায় নিলেন রাশিদ। ক্যানসার এবং মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জোড়া থাবা এড়িয়ে আর সমে ফেরা হল না তাঁর।

রাশিদ খান

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

রজনীগন্ধার মালাগুলো
ঠিক জায়গামতো রাখা হল।
কেউই কাঁদছে না, শুধু নিচুস্বরে কথা বলছে
পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে।
কেউ জেনুইনলি চাইল শোক ঢাকতে।
করুণ সারেঙ্গির মতো চোখমুখ, টিভি
ক্যামেরায় কেউ কথা বলল।
দুচারটে ফুল ও পাতারা ছাড়া
একে একে সব
চলে যাবে অন্তিমের দিকে।

সুর, তখনও মূর্ছনা ছড়ায়

লেখা ৭

শীতকালে হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব

ডা. প্রভাত ভট্টাচার্য

অনেক সময়ই দেখা যায় যে শীতকালে তাপমাত্রা মাঝে মাঝে খানিকটা বেড়ে যায়। আবার হয়তো দু একদিন পরে ঠান্ডা পড়ে যায়। এর ফলে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে।

হঠাৎ তাপমাত্রা বাড়ার ফলে একটা অস্বস্তি তো হয়ই , তা ছাড়াও সর্দি কাশির প্রকোপ বেড়ে যেতে পারে, যাদের হাঁপানি আছে তাদের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যেতে পারে । অন্যান্য সংক্রমণের সম্ভাবনাও বাড়ে। তাছাড়াও , হার্টের অসুখের উপসর্গ বেড়ে যেতে পারে। মাইগ্রেনের প্রকোপ বেড়ে যেতে পারে। সুতরাং এই সব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। নতুন কোন উপসর্গ দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। আবার এর পরপরই আবার ঠান্ডা পড়লেও একই ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব হয় তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তনের জন্য। এই ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে। আর এসব সমস্যা বেশি দেখা যায় তাদেরই, যাদের শরীর অপেক্ষাকৃত দুর্বল, বিভিন্ন রোগ, যেমন ডায়াবেটিস, ক্যানসার আছে। তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

কিছুদিন হল শোনা যাচ্ছে যে নতুন করে করোনা রোগ আবার দেখা দিয়েছে। সেই আতঙ্কের দিনের স্মৃতি খুব পুরোনো নয়। তাই সবাই শঙ্কিত। কিন্তু এখনও পরিস্কার চিত্র কিছু পাওয়া যায়নি। তাই অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে সাবধানে থাকতে হবে। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে ,বিশেষত তাদের ক্ষেত্রে, যাদের অন্যান্য অসুখ, যেমন ডায়াবেটিস, হাই প্রেসার, হার্টের অসুখ, ক্যানসার ,প্রভৃতি আছে, অর্থাৎ কোমরবিডিটি আছে। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেয়ে শরীরকে ঠিক রাখতে হবে ।

লেখা ৮

কলকাতার রেজালা

জাহিরুল হাসান

আপনাদের মধ্যে কারা কারা যৌবনে ষাট-সত্তরের দশকে চাঁদনির সাবির হোটেলে খেয়েছেন? বা, যাঁরা এখন যুবক কে কে হাল আমলে সাবিরে খেয়েছেন? যদি খেয়ে থাকেন তা হলে, নিশ্চয় বলতে পারবেন ওখানকার সবচেয়ে নামি খাবার কোনটা? পঞ্চাশের দশক থেকেই খ্যাতি ছড়িয়েছে সাবিরের অপূর্ব স্বাদের মাংসের রান্না রেজালার। ছোটোবেলা থেকে বাবা-কাকাদের মুখে শুনে এসেছি সাবিরের এই ডিশ রেজিস্টার্ড করা। আসলে, এটা সাবিরেরই আবিষ্কার। এখন ঘরে ঘরে রেসিপি দেখে গিন্নিরা রান্না করে ফেলছেন। তা হলেও, সাবির নামের একটা জাদু আছে।

আজ নাতিকে নিয়ে গিয়েছিলাম সেই সাবিরে। মালিকানা মনে হয় একই পরিবারের হাতে রয়েছে। কাউন্টারে এক যুবক বসেছিল, সেও ইতিহাসের সবটা জানে না। কিছুটা বললাম তাকে, একটু হইচই করলাম বয়-বেয়ারেদের পুরোনো গল্প শুনিয়ে। ওরা ধরে আনল একজন পুরোনো আমলের খানসামাকে যে নাকি আড়াই টাকায় কাস্টমারদের রেজালা খাইয়েছে। আজ আমাদের খাওয়াল আড়াইশো টাকায়। ১৯৪৮ সালে স্থাপিত এই অওধি শৈলীর মোগলাই রেস্তোরাঁ। তার মানে এ বছর তার ৭৫ বর্ষপূর্তি, হীরক জয়ন্তী। ঢোকার মুখে হেরিটেজ তকমা লাগানো।

আপশোশের কথা, বিবিধ ঐতিহ্যের শহর কলকাতার মানুষ হয় একেবারে ভুলে গেছেন সাবিরকে নয় চেনেনই না, প্রবীণরা যাঁরা মনে রেখেছেন তাঁরাও কেউ কেউ 'সেই আগের সাবির আর নেই' বলে উড়িয়ে দিতে চান।

ঠিক কথা, ৭৫ বছর পরে সাবির আর আগের মতো ঝকঝকে নেই, থাকবে কী করে? এখন তো, ম্যাকডোনাল্ড-কেএফসির জমানা! নিজেরই সম্পদগুলিকে কত সহজে আমরা ভুলে থাকি। আবার অনেকে মনে করেন মোগলাই খানার ঘাঁটি দিল্লি-লখনউ-হায়দরাবাদ, কলকাতা তো ব্রিটিশ শহর, তার মোগলাই যা কিছু সে হাতফেরতা।

কিন্তু আর কিছু না হোক, রেজালার জন্য উত্তর ভারতীয়রাও যাঁরা এসব নিয়ে চর্চা করেন, কৃতিত্ব দেন সাবিরকে। তারানা হুসেন খান খাদ্য-গবেষক, গ্রন্থকার। তিনি স্বীকার করেছেন যে তাঁর উত্তর ভারত-উত্তর প্রদেশ-অওধ-রামপুর খাদ্য বৃত্তে রেজালা ছিল না, নেই। তাঁকে আসতে হয়েছে কলকাতায় রেজালা ও সাবির হোটেল সম্পর্কে জানার জন্য।

আমরা যারা স্বাধীনতার ঠিক আগে-পরের প্রজন্ম আমাদের সেই স্মৃতির শহর কলকাতার কিছু হারিয়ে যাওয়া কিছু এখনও টিকে থাকা মণি-মুক্তোর একটি চাঁদনির সাবির হোটেল। ওদিকে গেলে একবার তন্দুরি-রেজালা-শাহি টুকরার স্বাদ নিয়ে দেখতে পারেন।

লেখা ৯

বিদায়, ফুটবলের কিংবদন্তি

বাবলু সাহা

চলে গেলেন বিশ্ব ফুটবলের আর এক কিংবদন্তি ফ্রাঞ্জ আন্তন বেকেনবাওয়ার, বিশ্ব ফুটবল একসময়ে যাঁকে কাইজার নামে চিনত । সম্প্রতি ৭৯ বছর বয়েসে তিনি অস্ট্রিয়ার সলজবুর্গে প্রয়াত হন। তাঁর ফুটবল জীবন শুরু মাত্র ২০ বছর বয়সে। খেলা শুরু করেছিলেন প্রথমে সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে। পরে মিডফিল্ডার, এবং সেখান থেকে পরবর্তীকালে বিশ্বের সেরা একজন ডিফেন্ডার।

বেকেনবাওয়ার বিশ্বকাপ ফুটবল সহ মোট ১০৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। তাঁর সর্বমোট আন্তর্জাতিক গোল সংখ্যা ৫৬০। বেকেনবাওয়ার ক্লাব ফুটবলে বায়ার্ন মিউনখের হয়ে ১৩বছর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। বাভারিয়ানদের হয়ে খেলার সময়ে দু-বার ব্যালন ডিওর জয়ী হন। তাঁর অধীনে একটি চ্যাম্পিয়নস লীগ ছাড়াও মোট নয়টি ট্রফি এসেছিল বায়ার্নের ক্যবিনেটে।

১৯৭০এর দশকে বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে হ্যাটট্রিক ইউরোপিয়ান কাপ জিতেছেন। ১৯৭৭-১৯৮৮ আমেরিকার নিউইয়র্কে কসমস ক্লাবের হয়ে ৮০ ম্যাচে ১৭ গোল করেছিলেন।

পশ্চিম জার্মানির হয়ে খেলেন ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত । ১৯৭৪ সালে তাঁর অধিনায়কত্বে জার্মানি বিশ্বকাপ জয় করে।

বিশ্ব ফুটবল ইতিহাসে মাত্র তিনজন, ফুটবলার এবং কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জয়ের নজির গড়েন। তাঁদের মধ্যে আছেন ব্রাজিলের মারিও জাগালো (যিনি সদ্য প্রয়াত হয়েছেন), ফ্রান্সের দিদিয়ের দেঁশ এবং জার্মানির বেকেনবাওয়ার। ওয়ার্ল্ড সকার ম্যাগাজিনের বিচারে বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলারদের তালিকায় তাঁর ছিল চতুর্থ স্থান।

বিশ্বকাপ ফুটবলে বেকেনবাউয়ার ব্রোঞ্জ বুট পান ১৯৬৬-তে, রুপোর কাপ – ১৯৭৪-এ, ফিফা অর্ডার অফ মেরিট অর্জন করেন ১৯৮৪ সালে। ইউরোপীয়ান ফুটবলার অফ দা ইয়ার হয়েছেন ১৯৭২। বিশ্বকাপ ফুটবল (১৯৬৬-৭০-৭৪) সহ মোট ১০৩ টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন তিনি। প্রসঙ্গত বলা থাক যে, বেকেনবাওয়ারের এর কন্ঠে সিঙ্গল মিউজিক (Apple Music 2018) ' 'BOWNIK ' আত্মপ্রকাশ করে।

লেখা ১০

কুস্তি জগতে জটিলতা বাড়ছে

অলক সোম

সম্প্রতি ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সঞ্জয়। তিনি যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত কুস্তিকর্তা ব্রিজভূষণের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তার পরেই প্রতিবাদে কুস্তি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন সাক্ষী মালিক। সেই সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী কুস্তিগির। আর এক পদকজয়ী কুস্তিগির বজরং 'পদ্মশ্রী' ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে সংসদে যান তিনি। কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগেই তাঁকে পুলিশ আটকায়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেননি বজরং। পরে সংসদের সামনের রাস্তায় সেই পদক ফেলে দিয়ে আসেন।

ভারতীয় কুস্তি সংস্থার নতুন কমিটি বিলম্বিত করেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক। তার পরেও কুস্তিগিরদের প্রতিবাদ কমছে না। বরং তা আরও জোরালো হচ্ছে। সম্প্রতি পদ্মশ্রী ফিরিয়ে দিয়েছেন কুস্তিগির বজরং পুনিয়া। কুস্তি থেকে অবসর নিয়ে নিয়েছেন সাক্ষী মালিক। সেই তালিকায় এবার বিনেশ ফোগাট। তিনিও নিজের খেলরত্ন ও অর্জুন পুরস্কার ফিরিয়ে দিতে চাইছেন। প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে তিনি নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, কমনওয়েলথ ও এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছেন তিনি। তাঁর খেলার জন্য খেলরত্ন ও অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে তাঁকে। কিন্তু ভারতের কুস্তি সংস্থায় দুর্নীতি কমছে না। যে ব্রিজভূষণ শরণ সিংহের বিরুদ্ধে এত দিন প্রতিবাদ করে তাঁকে গদি থেকে তাঁরা সরালেন সেই ব্রিজভূষণেরই ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় সিংহ ফেডারেশনের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তারই প্রতিবাদ হিসাবে নিজের দুই সম্মান ফিরিয়ে দিতে চাইছেন তিনি।

বজরং পরে সাংবাদিকদের বলেন, তাঁরা আগেই বলেছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের মেয়ে এবং বোনেদের বাঁচানোর জন্য লড়াই করছেন। ওদের ন্যায়বিচার এখনও দিতে পারেননি তাঁরা তাই তাঁর মনে হয় আর এই সম্মানের যোগ্য নন তিনি।

সম্প্রতি বজরং সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানান যে, তিনি পদ্মশ্রী ফিরিয়ে দিচ্ছেন। বজরং তাঁর বার্তায় প্রধানমন্ত্রীকে লেখেন, তিনি পদ্মশ্রী সম্মান ফিরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ দেশের কুস্তিগিরদের সঙ্গে এমন অনেক কিছু ঘটছে যার প্রতি দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি।

বজরং তাঁর চিঠিতে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ তাঁরা শুরু করেছিলেন, সেটার উল্লেখ করেন। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ছিল কুস্তিগিরদের। দিল্লির যন্তর মন্তরের সামনে ধর্না দিয়েছিলেন বজরংরা। তিনি বলেন, তাঁরা প্রতিবাদ বন্ধ করেছিলেন, কারণ সরকার তাঁদের কথা দিয়েছিল ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু তিন মাস কেটে গেলেও এফআইআর হয়নি দেখে তাঁরা আবার প্রতিবাদ শুরু করেন। কিন্তু পরে দেখা যায় ১৯টি অভিযোগ থাকলেও তা কমে আসে সাতে। এটা প্রমাণ করে যে ব্রিজভূষণ কতটা প্রভাবশালী। প্রতিবাদে ১২ জন কুস্তিগির প্রতিবাদ করা বন্ধ করে দেন।

এ দিকে, রিও অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জয়ী সাক্ষী বলেন, তাঁকে আর কেউ কখনও কুস্তি লড়তে দেখবে না। তাঁর পাশে ছিলেন বজরং পুনিয়া। তিনি বলেন, তাঁরা আর কুস্তি লড়তে পরাবেন কি না জানেন না। কারণ রাজনীতি কী ভাবে কাজ করে তা তাঁরা জানেন না।

তার মাঝেই সম্প্রতি কুস্তি সংস্থার নতুন কমিটি সাসপেন্ড করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার নির্বাচিত হওয়ার পরেই জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৫ ও অনূর্ধ্ব-২০ স্তরের প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করেন সঞ্জয়। তিনি জানান, চলতি মাসের শেষে উত্তরপ্রদেশের গোন্ডাতে সেই

প্রতিযোগিতা হবে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের মনে হয়েছে, কোনো পরিকল্পনা না করেই সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার ফলে অংশ নিতে চাওয়া কুস্তিগিরেরা নিজেদের তৈরি করার পর্যাপ্ত সময় পাবেন না।

সংবাদ সংস্থা আরও জানিয়েছে ভারতীয় কুস্তি সংস্থার সংবিধান অনুযায়ী, যুব বা সিনিয়র স্তরের কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন করার আগে এগজ়িকিউটিভ কমিটির বৈঠক হয়। সেই বৈঠকের পরে প্রতিযোগিতার সূচি প্রকাশ করা হয়। প্রত্যেকটি প্রতিযোগিতার আগে কুস্তিগিরদের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে হয়। সব থেকে কম ১৫ দিন সময় দিতে হয় প্রস্তুতির। সেই সব নিয়মের তোয়াক্কা করেননি সঞ্জয়। নিজের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। সেই কারণে নতুন কমিটি সাসপেন্ড করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রীড়া মন্ত্রক। তবে কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়নি। পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সেই সময়ে একটি অ্যাড-হক কমিটি ভারতের কুস্তি চালাবে।

মোহময়ী কুর্গ (শেষ ভাগ)

প্রভাত ভট্টাচার্য

এই দেশের মধ্যেই রয়েছে এমন কিছু মোহময়, রোমাঞ্চকর জায়গা যেখানে বেড়াতে গেলে আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে ওঠে নতুনের আহ্বানে। এরকমই একটি জায়গা কুর্গ নিয়ে গত সংখ্যায় শুরু হয়েছিল একটি ভ্রমণ কাহিনী। শেষ অংশ রইলো এই সংখ্যায়…

প্রথমে যাওয়া হল রাজা'স সীট দেখতে। এটি হল একটি সুন্দর উদ্যান, যেখানে রাজারা আসতেন অবকাশ যাপনের জন্য এবং সুর্যাস্ত উপভোগ করার জন্য।

সুন্দর সাজানো উদ্যান । ডাইনোসর, উট, গন্ডার, প্রভৃতির মূর্তি রয়েছে। বসার জায়গাও রয়েছে অনেক। দূরে দেখা যায় মনোরম উপত্যকা।

বেশ ভালো লাগছিল জায়গাটা ।ছবি তোলা হল কিছু । এবারে যেতে হবে অন্যান্য জায়গায় ।

পরবর্তী গন্তব্য হল মাদিকেরি ফোর্ট। এই দূর্গ নির্মাণ করেছিলেন মুদ্দুরাজা,সপ্তদশ শতাব্দীতে । তিনি দুর্গের মধ্যে প্রাসাদও তৈরি করেছিলেন। টিপু সুলতান এর সংস্কার করেন। এরপর এটি আসে ডোড্ডা বিরা রাজেন্দ্র নিয়ন্ত্রণে। পরে লিঙ্গ রাজেন্দ্র এই দুর্গের সংস্কারসাধন করেন। এরপর এটি আসে ব্রিটিশদের অধিকারে । এখানে আছে একটি মিউজিয়াম এবং সংলগ্ন গির্জা।

এদিক ওদিক ঘোরা হল আর ছবি তোলা হল। এক জায়গায় কামান ও আছে। সবকিছু প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে ।

এবারে জলপ্রপাত। দেখা হল অ্যাবে ফলস। আগে একে বলা হত জেসি ফলস। এটি কাবেরী নদীর নিকটবর্তী। একে ঘিরে রয়েছে কফি ও মশলার গাছ।

বেশ খানিকটা নামতে হয় ।দেখতে হয় রেলিং দিয়ে ঘেরা জায়গা থেকে । ভীষণ সুন্দর এই জলপ্রপাত। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে হয় ।

এরপর দেখা হল গ্লাস ব্রিজ। এর ওপর দিয়ে হাঁটা এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা ।ওখানে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলাম পার্শবর্তী উপত্যকার অপরূপ সৌন্দর্য ।

একবারে দশজন করে ওঠানো হচ্ছে। দশ মিনিট হল দেখার সময়।

এরপর হোটেলে ফিরে মধ্যাহ্নভোজন । সন্ধেবেলায় যাওয়া হল দশেরা দেখতে। এখানে মহা সমারোহে দশেরা উদযাপন করা হয়। ভালোই লাগলো দেখতে। পরের দিন যাওয়া দুবারে এলিফ্যান্ট ক্যাম্প দেখতে । রাবণ বলে দিয়েছে যে সকাল সকাল যেতে হবে। আমরাও তৈরী হয়ে নিলাম সেইমত ।

এই ক্যাম্প রয়েছে কাবেরী নদীর তীরে। এটি হল হাতিদের সংরক্ষণের উদ্যোগের একটি অংশ। সংলগ্ন অরণ্যে অন্যান্য বন্যপ্রাণীও দেখা যায় ।

বোটে করে যাওয়া হল আসল জায়গায় । সকলেরই বেশ ভালো লাগছিল। এক অন্য রকমের পরিবেশ।

সাক্ষাত হল হাতিদের সঙ্গে । অনেক দাঁতাল হাতি রয়েছে, আছে বাচচা হাতিও। দেখা হল হাতিদের খাওয়া এবং জলে চান করার দৃশ্য। কেউ ইচ্ছে করলে চান করানোতে অংশগ্রহণ করতে পারে, অবশ্যই মাহুতের তত্ত্বাবধানে ।

বেশ খানিকক্ষণ কাটালাম আমরা সেখানে। এ এক দারুণ অভিজ্ঞতা। চিড়িয়াখানায় হাতি দেখা আর এখানে এই প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। খুব ভালো লাগলো আমাদের।

আবার নৌকায় করে ফিরে এলাম আমরা। এবারে যাওয়া নিসর্গধাম দেখতে।

নিসর্গধাম হল কাবেরী নদীর ওপরে এক দ্বীপ, যেখানে রয়েছে সুন্দর পার্ক এবং বন।

বাইরে কিছু দোকানপাট রয়েছে। একপ্রস্থ শপিং হল। এবারে ঝুলন্ত সেতুর ওপর দিয়ে ভেতরে যাওয়া হল। সত্যিই খুব সুন্দর জায়গা। প্রচুর গাছপালা, যার মধ্যে রয়েছে বাঁশঝাড়, লগ হাউস, বাচচাদের খেলার জায়গা, আদিবাসীদের জীবনযাত্রার মডেল, ফোয়ারা, এইসব। লগ হাউসে উঠে বেশ ভালো লাগলো।

সবাই ঘুরে বেড়ালাম এদিক সেদিক। লগহাউসে উঠে খুব ভালো লাগলো। বাঁশঝাড়ের মাঝে বেশ একটা অন্যরকম অনুভূতি হল। ।

ছোটো ঝুলন্ত ব্রিজটাও বেশ ভালো।

এরপর কফি বাগিচা দেখার পালা। এখানকার কফি বিখ্যাত। টিকিট কেটে ঢুকতে হয়।

এই প্রথম দেখলাম কফি গাছ আর তার ফল। জানা গেল কফির প্রক্রিয়াকরণ , কিভাবে গাছের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, এইসব , তারপর কত রকমের কফি হয়, হাল্কা থেকে ঘন কফির কথা। জানা গেল অনেক কিছু। কফি কেনাও হল।

এরপর হোটেলে ফিরে খাওয়াদাওয়া আর বিশ্রাম ,সঙ্গে গল্পসল্প ।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের পরে চেক আউট করলাম কুর্গ প্যালেস থেকে । যেতে যেতে দেখে নেওয়া হল গোল্ডেন বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ।খুব সুন্দর। আর শান্ত পরিবেশ। এর আসল নাম হল নামড্রলিং মনাসট্রি। এটি হল ভারতের ঘন তিব্বতী জনবসতি যুক্ত জায়গাগুলির মধ্যে একটি। ঘন্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছিল ।

এরপর আবার চড়লাম গাড়িতে। এগিয়ে চললাম পথের দু ধারের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে।

বিদায় কুর্গ । সঞ্চয় করে নিয়ে চলেছি চমৎকার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা।

আবার এসো, যেন বলে উঠলো কুর্গের আকাশ বাতাস ।

লেখা ১২

অজানার উজানে (চতুর্থ ভাগ)

বাবলু সাহা

এই বাংলার আনাচে কানাচে রয়েছে রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের জন্য দারুন দারুন সব জায়গা। এরকমই একটি জায়গার রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা নিয়ে চলছে ধারাবাহিক রচনা। চতুর্থ অংশ রইলো এই সংখ্যায়…

আমার পাহাড়ে চড়ার অভ্যাস বা শিক্ষা থাকলেও , ওঠার সময় প্রথমেই হুড়মুড় করে না উঠে রাস্তার ধারে পাথর রেখে বা গাছের ডাল ভেঙে না ওঠাটা ছিল আমার সেবারকার অভিযানে অন্যতম একটি ভুল বা এমনকি বলা যায় অপরাধও। তার উপরে ভসেদিন আবার আমার পায়ে ছিল কিটোর পা ঢাকা জুতো। এই জুতো পরতে যারা অভ্যস্ত তারাই জানে এটা পরে পাহাড়ের খাড়াই বা নিছু ঢাল বেয়ে নামা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

যাই হোক, বিপদের ত্রাতা মধুসূদন হিসাবে এবার ছেলে দুটির আগমনের জন্য ঘন জঙ্গলের রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকার পালা। অবশেষে নির্জন জঙ্গলের নিথর নৈশব্দ ভেদ করে বেশ জোরে মোবাইলের গানের আওয়াজ পেয়ে বুঝলাম তাঁরা আসছেন। যারা শুনেছেন তারা

জানেন এ হল তেমন মোবাইল যাতে কেবল জোরে গান বাজানো ছাড়া আর কোনো কাজেই আসে না। একটু বাদেই জঙ্গল ভেঙে ছেলে দুটির দেখা মিলল।

দুজনে এসে এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে একেবারে শর্টকাট একটি বুনোস্য বুনো পথ (!) ধরে আক্ষরিক অর্থেই যাকে বলে হুড়মুড়িয়ে নামতে থাকল। বাপরে , সে কী উৎরাই ! একেক বার হাড় হিম হয়ে গেলেও বুঝলাম জঙ্গলের রোমাঞ্চের এটাও একটা ধরণ। আসলে ওরকম ঘন পাহাড়ি জঙ্গলে ছোটো থেকেই চলতে অভ্যস্ত হওয়ায় ওদের কাছে এটাই স্বাভাবিক, জানি। কিন্তু আমার যেটুকু বা অভ্যেস ছিল সোনুর তো তা-ও ছিল না। আর বলছি বটে এখন , কিন্তু সেই সময়ে একেকবার আমার নিজেরও যে প্রাণ উড়ে যায়নি তা নয়। তার ওপর নামার সময়ে একেবারে গোড়া থেকেই বিধি অন্তত আমাদের ব্যাপারে বাম। ফলে কখনো ঘন ঝোপঝাড় পেরিয়ে বা ডিঙ্গিয়ে পা বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছে। তার ওপর আচমকা মুখের ওপর নেমে আসা বড়ো বড়ো গাছের ডাল বা পাতা দুহাতে না সরালে নামাই কঠিন। সে যা অবস্থা তাতে গাছ-টাছের ডালপালা ধরে বা অন্য কোনো ভাবে ভারসাম্য রাখাই কঠিন, তার উপর যে সব ডাল মুখের সামনে এসে পড়ছে তাদের গা ভর্তি আবার বড়ো বড়ো আর ছুঁচলো লম্বা কাঁটা । সেই সঙ্গে তালে তাল মেলাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বুনো লতা, সাপের মতো যারা গায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে স্মার্টলি বলতে চাইছে যেন, 'যেতে নাহি দিব' । কিন্তু সে আদুরে আবদার রাখার তো উপায় নেই কোনো। ফলে নিচু হয়ে বা ডিঙি মেরে সেগুলোর সেই সপ্রেম আলিঙ্গন ছাড়াতে হচ্ছে নির্দয় ভাবে। এভাবে নামছি, আচমকা মানুষ সমান একটা নিচু হয়ে ঝুলে থাকা গাছের ডালে বাড়ি খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখে বাপরে বলে জঙ্গলের মধ্যে ছিটকে পড়ল সোনু। কপাল ফেটে রক্তগঙ্গা বলতে যা বোঝায় তা-ই।

শেষ ভাগ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

২৯ কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

১

২৯ তে পা। কে আই এফ এফ এফ। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে বলিউডি জমজমাট। নন্দনে লিন্ডসে অ্যান্ডারসনের পাশে দেব আনন্দ। নেতাজী স্টেডিয়ামে উত্তমকুমার। দেয়া নেয়া। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সম্পূর্ণ জনমুখী। ৩৯ দেশের ২১৯ ছবি। সারা পৃথিবীর সাম্প্রতিকতম ছবি চেনার দারুন সুযোগ। পাশাপাশি জনমুখীনতাও ছিল এই উৎসবে। ফলে মেলালেন তিনি মেলালেন। মৃণাল সেনের ১০০। তাঁকে ঘিরে আলাদা এক বিভাগই তৈরি করা হয়। শুধু ছবি দেখানো নয়, প্রদর্শনীও। আম জনতার জন্যেই উদ্বোধনী উৎসব। সেখানে এবার অবশ্য অমিতাভ বচ্চন বা শাহরুখ খান নেই, পরিবর্তে সলমান খান, অনিল কাপুর, শত্রুঘ্ন সিনহা এবং সোনালি চক্রবর্তী। সঙ্গে টালিগঞ্জ শিল্পী বিগ্রেড তো ছিলই। উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এক দিন নেতাজিতে। তারপর থেকে নন্দন এবং কলকাতার আরও অনেক প্রেক্ষাগৃহে। শুধু প্রেস ডেলিগেট নয় আমজনতার প্রবেশের অধিকার ছিল। যদিও সীমিত। তাই বা কম কিসে? ৫ ডিসেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর অবধি কলকাতা ছিল সিনেমা-শহর। নিউ-টাউনও।

২

ফিরে এল ‘বেনহার’ । ঘোড়ায় টানা রথের দৌড় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম কিশোর কালে।

চালর্স হেস্টনের এই ছবি যখন হলিউডে নির্মিত হয় তখন জন্ম হয়নি আমার। দেখেছিলাম পরে কিশোর কালে উত্তরের টকি হাউস-এ। ছবির মূল ভাবনা কতখানি বুঝেছিলাম জানি না,দেখতে যাওয়া শুধু রথের দৌড়ের জন্যেই। সেই স্মৃতি ফিরে এল এবারের কে আই এফ এফ-২৬-এ।২৪ টা ক্যামেরায় তোলা সেই রথের দৌড় সিনেমায় ইতিহাস হয়ে আছে। স্মৃতি আরও ছিল,দেব আনন্দের স্মৃতি। তাকে ঘিরেও প্রর্দশনী। বাজি, জনি মেরা নাম, জুয়েল থিফ ও জিত। দেব আনন্দ১০০। আর এই ১০০তে আরো অনেকেই। রিচার্ড অ্যাটেনবরো,চালটন হেস্টন,ওসবান সেমবেনে, মুকেশ ও শৈলেন্দ্র, মৃণাল সেন এবং লিন্ডসে অ্যান্ডারসন। আর লিন্ডসের সূত্রেই আবার স্মৃতিজাগানিয়া ‘ইফ’ । স্কুল ছাত্রদের বিপ্লবের ছবি।সেই ওল্ড হলিউডি সংস্কৃতি। এবং সেই সুবাদেই জিনা লোলাব্রিজিতা।

৩

কে আই এফ এফ তো প্রতিযোগিতামূলক। একটা নয় খান পাঁচেক বিভাগে প্রতিযোগিতা। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের প্রতিযোগিতা, যেখানে সেরা ছবি পেল সোনার বাঘ। এছাড়া এশিয়ান সিলেক্ট,ভারতীয় ভাষার সিনেমার প্রতিযোগিতা, স্বল্প দৈর্ঘ্য-ছবির কম্পিটিশন, ডকুমেন্টারি ছবির লড়াই। এবারের ফোকাস দেশ স্পেন। ছিল এক ঝাঁক অস্ট্রেলিয়ার সিনেমা। মূল প্রতিযোগিতা থেকে জুড়ি পুরস্কার পেল অঞ্জন দত্তের ছবি ‘এখন চালচিত্র ’ । ব্যক্তিগত ছবি । যাকে বলে পার্সোনাল ফিল্ম। থিয়েটার থেকে অঞ্জনকে সিনেমায় আনেন মৃণাল সেন। ছবির নাম ‘চালচিত্র’ । এ যেন সে চালচিত্রে ফিরে যাওয়া। অঞ্জনের সিনেমা গুরু মৃণাল। তাঁর মৃত্যুর পর এই মৃণাল ১০০-তে এই ছবি যেন গুরুর প্রতি অঞ্জনের শ্রদ্ধার্ঘ। যার কেন্দ্রে রয়েছে চালচিত্র-নির্মাণ। মৃণাল সেনকে আবিষ্কার

তারই ভনিতার চোখ দিয়ে। ফেস্টিভ্যালকে ঘিরে এ এক অন্য অভিজ্ঞতা। সিনেমা ইন্টারন্যাশালে ছিল বিদেশের সাম্প্রতিক সব ছবি। মূলত এই বিভাগ যেন ফেস্টিভ্যাল অফ ফেস্টিভ্যালস। পৃথিবীর নানা চলচ্চিত্র উৎসব থেকে বাছাই ছবি।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন